## ।। পঞ্চম অধ্যায় ।।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেলে, ১৩২২ সালের আশ্বিন মাসের শেষভাগে রবী-দ্রনাথ কাশ্মীর যাত্রা করলেন। তাঁর সঙ্গে রথী-দ্রনাথ, প্রতিমাদেবী, প্রতিমাদেবীর ভগ্নী কমলাদেবীও তাঁর স্বামী হেমচ-দ্র মজুমদার গেলেন। পরিবার ও পরিজন ছাড়া সঙ্গে ছিলেন কবি সত্যে-দ্রনাথ দত্ত। সেবারে কাশ্মীরে আরও অনেকে গিয়েছিলেন — বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সত্যরঞ্জন দাশ ( S.R.Das ) ও জ্যোতিরঞ্জন দাশের (J.R. Das রেঙ্গুনের ) পরিবার। সকলেই কবির পরিচিত। কাশ্মীর-ভ্রমণে দিন পনেরো মাত্র যায়।

কাশ্মীরের তদানী-তন শিক্ষা-মন্ত্রী পণ্ডিত জগদীশ চ-দ্র চট্টোপাধ্যায়[১] কিছুকাল পূর্বে শান্তিনিকেতনে আসেন; তিনিই কবিকে নিম-ত্রণ করে নিয়ে যান। শ্রীনগরের পাদমূলে বিতস্তানদীবক্ষে টিকারীর মহারাজার "পরীস্থান' নামক গৃহ নৌকাখানি কবির জন্য নির্দিষ্ট হয়।

শ্রীনগরে পৌঁছে কবি লিখছেন, 'অভিন-দন অভ্যর্থনা চলিতেছে, এখনও কাশ্মীরে পৌঁছাই নাই।"

" I am technically in Kashmir, but still have not entered its gate. I am passing through the purgatory of public receptions and friendly solicitations, but Paradise is in sight."[২]

শ্রীনগরে মহীদল কলেজের অভ্যর্থনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তখনকার আয়োজনকারীদের অন্যতম ছিলেন অধ্যাপক মুকু-দলাল চক্রবর্তী।

শ্রীনগর বাসকালে একটি কৌতুকজনক ঘটনা ঘটে। ব্রিটিশ রেসিডে-ট শ্রীনগরের সর্বময় কর্তা। বিশিষ্ট আগ-তুকরা রাজধানীতে এসে তাঁর গৃহে কার্ড রেখে যেতেন। অতঃপর তিনি তাঁদের কাউকে লাঞ্চে, কাউকে ডিনারে যথাযোগ্য মত আহ্বান করতেন। রবী-দ্রনাথ তখন নূতন Sir হয়েছেন, সকলেই মনে করেছিলেন কবি ব্রিটিশ আমলাতে-ন্ত্রর আদব কায়দা মতো রেসিডে-টের বাড়িতে গিয়ে কার্ড রেখে আসবেন। কি-তু তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন না। রেসিডে-ট দূর থেকে তাঁকে একদিন দেখেন এবং তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার ইচ্ছা এখানে সেখানে প্রকাশ করেন। কি-তু কবি তাতে কর্ণপাত করেন নি; রেসিডে-ট ব্রিটিশ শাসনের আদব কায়দা ভাঙতে পারলেন না।[৩]

রবী-দ্রনাথ শ্রীনগরের বাইরে কোথাও যান নি। একদিন কাশ্মীরে বিখ্যাত মার্ত-ড মন্দিরের ভগ্নস্তূপ দেখতে যান। এ ছাড়া ঐ দেশের বিখ্যাত দ্রাক্ষাক্ষেত প-ধর্বলে বেড়াতে যান। তাঁর নৌকা-বাসে সকলেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন।

শ্রীনগর বাসকালে কবিকে দুইটি কবিতা লিখতে দেখা যায় 'মানসী' (৭ কার্তিক) ও 'বলাকা'। এ ছাড়া সমসাময়িক কয়েকজন বাঙালী কবির কবিতা অনুবাদ করতে দেখি।[৪] 'বলাকা'[৫] কবিতা থেকে রবী-দ্রনাথের এই যুগের কবিতাগুচ্ছের নামকরণ করা হয়। এই 'বলাকা' কবিতার সঙ্গে তুলনা হতে পারে 'রূপ'[৬] কবিতার। কবিতা দুটি পাশাপাশি পড়লে একটিকে আর একটির পরিপূরক এবং দুটি একত্রে মিলে যে এক অখ-ড তত্ত্বপ্রকাশ তা পাঠকদের স্পষ্ট মনে হবে।

এখন কবিতা আলোচনায় আসা যায়। কবি ছিলেন তখন কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে ঝিলম নদীর উপর হাউস-বোটে। স-ধ্যায় বোটের ছাদে বসে আছেন। স-ধ্যার অ-ধকার চারদিকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। কবি কল্পনা করছেন, যেন দিনের আলোতে ভাঁটা পড়েছে, রাত্রি তার কালো জলের জোয়ার নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। আকাশের অসংখ্য তারা কালো জলে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। মনে হচ্ছে, রাত্রির জোয়ারের প্লাবনে তারকাগুলি ফুলের মতো ভেসে আসছে। অ-ধকার পর্বতের পাদদেশে সারি সারি দেবদারু গাছ দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত প্রকৃতি —সেই—জল—স্থল—আকাশ—যেন সুপ্তাবিষ্ট; এই অবস্থায় তার গোপন মর্মর কথা সে ব্যক্ত করতে চাইছে, কি-তু তা সুস্পষ্ট বাণীরূপ লাভ করছে না। সেই অব্যক্ত বাণী চারিদিকের অ-ধকারের মধ্যে যেন প্রকাশের ব্যর্থতায় গুমরে মরছে।

সেই সময় হঠাৎ এক ঝাঁক হাঁস কোথা থেকে এসে তার মাথার উপর দিয়ে সশব্দে দূর—দূরা-তরে উড়ে গেল—মনে হ'ল, হংস বলাকার পাখার শব্দ নিস্তব্ধ স-ধ্যার অ-ধকার আকাশের বুকে বিদ্যুৎ-ছটার মতো রেখা এঁকে গেল। ঝড়ের গতির মধ্যে যে একটা উল্লাস ও মত্ততা আছে, হংস-বলাকার পাখার গতির মধ্যে নেই তেজ ও উন্মত্ততা। পাখার গতির শব্দে মনে হ'ল যেন উল্লাসের অট্টহাসিতে একটা বিস্ময়ের ঢেউ আকাশের উপর দিয়ে তরঙ্গিত হয়ে চলে গেল। অরণ্য-পর্বত-নদীতে-জলে-স্থলে-নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। সেই নিস্তব্ধতা যেন নীরবে ধ্যানমগ্ন ছিল। হংস-বলাকার পক্ষধ্বনি—উচ্চহাস্যময়ী অপ্সরার মতো সেই ধ্যানমগ্ন নিস্তব্ধতার তপস্যা ভঙ্গ করে দিয়ে চলে গেল। এই অনাচার

দেখে তিমির-মগ্ন পর্বতশ্রেণী ও দেওদারবন যেন কেঁপে উঠল ।

কবির চিন্তা ও ভাব প্রবলবেগে আলোড়িত হয়ে উঠল । চারিদিকের স্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ একটা গতির আবেগে লক্ষ্য করাতে কবি মনের জানালা দিয়ে দেখতে লাগলেন, যেন পাখার গতির শব্দে নিশ্চল প্রকৃতি অন্তরে অন্তরে একটা প্রবল গতির আবেগ অনুভব করছে । অচল পর্বত যেন কালবৈশাখীর ঝড়-তাড়িত মেঘের মতো নিরুদ্দিষ্টভাবে দূর-দূরান্তরে ছুটে যেতে চাইছে । সেই স্তব্ধ অন্ধকারে , সুপ্রাচ্ছন্ন বিশ্বপ্রকৃতির বুকের মধ্যে সুদূরের জন্য অব্যক্ত বেদনার ঢেউ জেগেছে । হংস - বলাকার পাখার চাঞ্চল্য ও গতিশীলতার বাণী যেন বিশ্বের প্রাণের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ।

মনে হল এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ ।
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ ;
তরু শ্রেণী চাহে , পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশেহারা ,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা ।

হংস-বলাকার পাখার চঞ্চল গতি-বেগ কবির কাছে সেই রাত্রে বিশ্বের মর্মবাণীটি উদ্ঘাটন করে দিল । সেই স্তব্ধতার আবরণ উন্মোচিত হল । কবি জল-স্থল-শূন্যে কেবল পাখার উদ্দাম , চঞ্চল শব্দ শুনতে লাগলেন । তাঁর মনে হতে লাগল —সমস্ত চরাচর ডানা মেলে উড়ে যাবার চেষ্টা করছে । তৃণগুল্ম মাটির উপর গাজিয়ে উঠছে , বড়ো হচ্ছে , কিন্তু তারা যেন উড়ে যাবার জন্য মাটির আকাশে ডানা ঝাপটাচ্ছে । মাটির নীচে লক্ষ লক্ষ বীজ তাদের অঙ্কুরের পাখা মেলে উড়ে যাবার চেষ্টা করছে । পর্বত , বন , উন্মুক্ত ডানার দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে অজানার উদ্দেশে উড়ে চলেছে , নক্ষত্রের দল অজানাকে না পাওয়ায় কাঁদতে কাঁদতে অন্ধকারকে চমকিত করে অজানার উদ্দেশে ছুটে চলেছে । বস্তু-বিশ্বের এই নিরন্তর প্রবাহই কেবল কবির মনের দরজায় দেখা দিচ্ছে না , মানুষের ভাব-

চিন্তা-বাণী ও যুগ থেকে যুগান্তরে ছুটে চলেছে বলে তার মনে হ'ল —

শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে ।

বিশ্ব-প্রকৃতি ও বিশ্ব-মানবের মধ্যে রূপ ও ভাবের নিরন্তর পরিবর্তন ও অগ্রগমন কবির চোখে একটা বিশিষ্ট সত্য বলে প্রতিভাত হল ।

রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যে 'গতিতত্ত্বের একটি বিষয় আছে । সম্ভবত এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ কবিতা হ'ল 'বলাকা' (সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা)।'চঞ্চলা' থেকে এক বছর পরে রচিত হলেও ভাবে ও কল্পনায় চঞ্চলা'র সঙ্গে এর সাদৃশ্য লক্ষণীয়, অথচ কাব্যরসে কবিতাটি উৎকৃষ্ট তর । বলাকার বিমানগতি এবং তার পাখার শব্দ কবির অদ্ভুত কল্পনার জাগরণের সহায়ক হয়েছে । উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে স্থাপিত হয়ে কবির গতি-অনুভূতি এখানে একটি বিস্ময়কর সমগ্রতা লাভ করেছে এবং এ অনুভূতি যে কবির একান্ত স্বকীয়, এ যে গতির সঙ্গে একান্ত কবি মানসের শ্রেষ্ঠতম মুহূর্তের বহিঃপ্রকাশ এ সম্পর্কে পাঠকের কোন সংশয় থাকে না । এই জন্যই এই কবিতাটির বহিরূপে ও অকৃত্রিম চমৎকারিত্ব ফুটে উঠেছে । ভাবনা ও ভাষার অপূর্ব মিলন । এই পর্যায়ের কাব্যে কবির উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশও যে পরিণত কবি-প্রতিভার পরিচায়ক হয়েছে তা কয়েকটি কবিতার মধ্যে এইটি বিশেষ ভাবে প্রমাণ করে ।

এখানে —

ঝঞ্ঝা-মদরসে মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে ।

এই সকল চরণের প্রাকৃতিক ধ্বনিময়তার সঙ্গে —

এই গিরিরাজি
এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে অজানা হইতে অজানায় ।
নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে ।

প্রভৃতি চরণের বিশেষ গতি-চাঞ্চল্যের সুর এত অনায়াসে মিলিত হয়ে পড়েছে যে কী উপায়ে কবি একটি থেকে অপরটিতে উত্তীর্ণ হচ্ছেন তা বোঝার অবকাশ থাকে না। ছন্দে ভঙ্গিতে অলংকারে এবং তীব্র আবেগে কবিতাটি কবির আত্মলীনতার শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক হয়েছে এবং শুধু গীতিধর্মের দিক থেকে Shelley -র Ode to the West Wind এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কবিতাটির শেষে "হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে" এই চিরস্মরণীয় চরণটির Lyric cry -এর মধ্যে কবির যে আত্ম-পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে তা যেমন সমসাময়িক কবিতা ও গানের সঙ্গে বলাকার সামঞ্জস্য স্থাপন করেছে তেমনি প্রবনতার সঙ্গে মানব সাধারণের সুদূরের প্রতি চির-তন আকাঙ্ক্ষাকেই রূপদান করেছে। কবিতাটির শেষাংশের আত্মবিবৃতি থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে কবি নৈর্ব্যক্তিক ভাবে গতিময় বিশ্বকে দর্শন করছেন না, সেই সঙ্গে তিনি আত্মদর্শনে মগ্ন ও বটে। এরই প্রতিধ্বনি গীতালির সর্বস্ব এবং ফাল্গুনী পূরবী প্রভৃতির ক্ষেত্রে দেখা গেছে।

এখন সহজেই অনুমান করা যায়, 'বলাকা'র দর্শনে বের্গসঁ এর প্রভাব সতত লক্ষণীয় নয়, কবি যে স্বকীয় উপলব্ধিতে পরিচালিত তাও বুঝতে হবে।
এই কবিতায় গতিতত্ত্বের কথা উল্লেখ না করেও প্রকৃতির বর্ণনায় কবিকে পেয়ে যাই —

ঐ শঙ্খধ্বনি
শব্দময়ী অপ্সর-রমণী
গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি।
উঠিল শিহরি
গিরিশ্রেণী তিমির-মগন,
শিহরিল দেওদার-বন।

'মানসী'[৭] কবিতাটিতে পাহাড় প্রাকৃতিক পরিবেশ সুন্দররূপে ফুটে উঠেছে। আমরা জানি কবি বিলম নদীর উপর হাউস-বোটে অবস্থান করছেন। এখান থেকে অতি প্রত্যূষে তিনি প্রকৃতির অপরূপ লীলা দর্শন করছেন। প্রভাতের আকাশ শিশিরে ছল ছল করছে এবং নদীর তীরবর্তী ঝাউবনে রৌদ্রে ঝলমল করে উঠছে। কবির হৃদয় শুধু ভরে উঠছে না। কবির আত্মদর্শন বিশ্বভুবনকে নিয়ে। পদ্মফুল টলমল হয়ে প্রতিভাত কবির মানস-সাগর জল। প্রকৃতির রূপের মাঝে বিশ্বভুবনের বিপুল ছায়া তিনি অবলোকন করতে পারছেন। এখানেই বিশ্বকবির স্বকীয়তা। 'মানসী' কবিতায় তত্ত্বের ছোঁয়া না থাকলেও বিলম নদীতে হাউস-

বোটে বাসকালে কবিতাটি প্রকৃতির রূপকে ধরে দিয়েছে। উল্লেখ্য চরণগুলি :

"আজ প্রভাতের আকাশটি এই
শিশির-ছলছল,
নদীর ধারের ঝাউগুলি ঐ
রৌদ্রে ঝলমল,
এমনি নিবিড় করে
এরা দাঁড়ায় হৃদয় ভরে
তাই তো আমি জানি
বিপুল বিশ্বভুবনখানি
অকূল মানস-সাগর জলে
কমল টলমল।"

একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, ৩৬ সংখ্যক কবিতাটির নাম-অনুসারেই কাব্যখানির নাম বলাকা। উল্লিখিত আলোচনা ব্যতিরেকে কবিতাটি সম্বন্ধে কবির কিছু আলোচনা তুলে ধরি[৮]:

"প্রকৃতিতে তো দেখলুম যে পর্বত অরণ্য স্তব্ধ হয়ে নেই, তারা চলেছে। তেমনি মানুষের যত আকাঙ্ক্ষা - কামনা-ভাবনা তারাও লোকালয়ের তীরে তীরে এক শতাব্দী-থেকে অন্য শতাব্দীতে, এ যুগ থেকে অন্য যুগে দলে দলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার কয়েকটি পূর্ববর্তী কবিতাতেও এই ভাব ছিল। কোন অস্পষ্ট অতীতে মানুষের চিত্তাধারায় সেই ভাবনা-কামনার জন্ম হয়েছে, কিন্তু তারা সেই আশ্রয় ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তাদের ভাবীকালের বাসা কোথায় জানি না, কিন্তু আমি অনুভব করলাম যে, মানুষের চেষ্টা বাণী ইচ্ছা চিন্তা কর্মস্রোত দলে দলে আকাশ পূর্ণ করে চলেছে। মানুষের এই যে অপূর্ণ অশ্রুত বাণী অতীত হতে যাত্রা করে চলেছে, আমি শুনলুম তারা যেন বলাকার পাখার শব্দে জাগ্রত হয়ে উঠেছে।"

"আমার অন্তরের ভিতরে প্রবেশ করেও দেখলুম যে, আমার মনের বাসা ছাড়া পাখি আলো-অন্ধকারের মধ্য দিয়ে অবিশ্রাম চলেছে চলেছে-যা কিছু গতিশীল যা কিছু উড়ে চলেছে তাদের সহযাত্রী হয়ে, অসংখ্য পাখিদের সঙ্গে সঙ্গে। এরা কোন দিকে চলেছে জানিনা, কিন্তু আমি বসে বসে নিখিলের এই পাখার ঝাপট শুনছি। সমস্ত আকাশ পাখার এই

বাণীতে ভরে গেছে "এখানে নয়, এখানে নয়, এ বাসায় থেকে থাকব : নয়, আরেক জায়গায় যেতে হবে।" আমার বলাকা চারদিকে নিখিলের এই বার্তা শুনতে পাচ্ছে।" তত্ত্বাংশের কথা ছেড়ে দিলেও কাব্যাংশে এ কবিতাটি উৎকৃষ্ট—সকলেই একে রবী-দ্রনাথের একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মনে করেন। বস্তুত এ প্রায় অনবদ্য, কেবল শেষের শ্লোকটি যেন হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে; মনে হয়, কবি তাঁর নবলব্ধ অলৌকিক অভিজ্ঞতাকে ধীরে সুস্থে আকার দিতে ভীত হয়েছেন, পাছে তার রঙ ফিকে হয়ে যায়।

প্রথম স্তবকে ঘনায়মান অন্ধকারে হিমালয়ের বর্ণনা। এতে তিনটি উপমা আছে, তিনটিই সত্যের অনভিভাবিত এক সৌন্দর্য প্রকাশ করে। বিশেষ, তিমিরাচ্ছন্ন দেওদারবনের উপমাটি অদ্ভুত সত্যরূপে কল্পনাকে অধিকার করে।

দ্বিতীয় স্তবকে হংসবলাকার অকস্মাৎ অলৌকিক পঞ্চসপ্তাননের শব্দ। 'শব্দের বিদ্যুৎছটা' বলে এই অপ্রত্যাশিত শব্দের আকস্মিকতা ও তীব্রগতিকে নূতন জীবন দান করা হয়েছে।

তৃতীয় স্তবকে প্রথম তিনটি ছত্রে হিমালয় সম্বন্ধে আমাদের পৌরাণিক যাবতীয় ধারণাকে ঠেসে ভরে দেওয়া হয়েছে।

চতুর্থ স্তবকে ওই পাখার শব্দে উন্মনা হিমালয়ের অবস্থা। এ পর্যন্ত কেবল বাহ্যব্যাপারের বর্ণনা, কবি স্বয়ং এর মধ্যে নাই।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তবকে কবির আত্মরস। ঢেউ যেমন একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে, পাখার উতলা ভাবও তেমনি ক্রম বিস্তার্যমান, বহির্বিশ্বকে ছাড়িয়ে তা কবিকে আক্রমণ করল, তখন বিশ্বের গতি-চেষ্টাকে কবি উপলব্ধি করলেন। কিন্তু এটাও বাইরের। ক্রমে মানুষের অন্তর্লোকের মানস-যাত্রার অসহ্য আকূতি এবং চরম মুহূর্তে নিজের আত্মার অজ্ঞাতযাত্রায় ক্রন্দন।

এ কবিতাটির মূলে একটি ক্ষণস্থায়ী অলৌকিক অভিজ্ঞতা এবং সেই আলোতে বিশ্বের নূতন রূপ দর্শন। অর্থাৎ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পটভূমিতে বিশ্বের নূতন সৃষ্টি।

## ।। উল্লেখপঞ্জী ।।

১. জগদীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ( J.C.Chatterjee ) : কাশ্মীর শৈবাদ্বৈত সম্বন্ধে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদনা করে তৎকালীন কাশ্মীর সরকারের সহায়তায় প্রকাশ করেন। শৈবাদ্বৈত - দর্শন সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থাদি লিখে যশস্বী হন। শান্তিনিকেতনে শৈবদর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা করেন। তাঁর সঙ্গে এক কাশ্মীরী অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত এসেছিলেন, তিনি সংস্কৃতে কথাবার্তা বলতেন। কয়েক বছর পরে এই অদ্বৈতবাদী ব্রাহ্মণ পুনরায় একাকী শান্তিনিকেতনে আসেন; পণ্ডিত জগদীশ চন্দ্র সম্বন্ধে নিন্দা করে যান—বৈদান্তিক মন না পেয়ে অদ্বৈতবাদী মত ব্যক্ত করতেন।

২. Letters to a friend, Srinagar, 12Oct. 1915, P- 70. দ্র. রবীন্দ্রনাথ—এন্ড্রুজ পত্রাবলী।

৩. এই তথ্যগুলি চক্রবর্তী চ্যাটার্জি কোম্পানির মালিক অধ্যাপক মুকুন্দলাল চক্রবর্তীর নিকট থেকে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত। ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮।

৪. "কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের "অশোক গুচ্ছ" ঘেঁটে ঘেঁটে দুটো কবিতা অর্জনার মত পাওয়া গেল —"। যুবতীর হাসি (পৃ. ২০), "মোহাগিনী ইথে তোর এত অভিমান' (পৃ: ৭০)। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "আলেখ্য' (পৃ: ১১) থেকে 'নূতন খাতা' অনুবাদ করেন।

৫. "সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি", সবুজ পত্র, কার্তিক ১৩২২। বলাকা ৩৬, রবীন্দ্ররচনাবলী ২য় খণ্ড জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ —।

৬. ২৭ পৌষ, ১৩২১ সুরুল। সবুজপত্র, ফাল্গুন ১৩২২। বলাকা ১৬, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২য় খণ্ড জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ।

৭. 'মানসী' ৭ কার্তিক ১৩২২, শ্রীনগরে বাসকালে রবীন্দ্রনাথের রচনা। এই কবিতাটি বলাকা কাব্যে ৩৫ সংখ্যক রূপে প্রকাশিত, রবীন্দ্ররচনাবলী ২য় খণ্ড জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ।

৮. শ্রী প্রমথনাথ বিশী - রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ দ্বিতীয় খণ্ড মিত্র ও ঘোষ কলিকাতা -১২ প্রথম 'মিত্র ও ঘোষ' সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৩৬৮ পৃ: ৬৭